পণ্ডিত দশটি অনুস্বর জুড়ে দিতে পারেন, তা হলে সংগীত এমনি সংস্কৃত হয়ে উঠবে যে, আমাদের মত প্রাকৃতজনেরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারবে না।

৩

এসব তো গেল সংগীতের বর্ণপরিচয়ের কথা, শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সুরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হলেও আলোচ্য।

শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়; অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনো পুরুষ কর্তৃক রচিত হয় নি, প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি একটানা তারের গায়ে ঘা মারলে প্রকৃতি অমনি সাত-সুরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন, মানুষে শুধু তার নকল করে। কিন্তু সে নকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিংবা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতিদত্ত স্বরগ্রামের কোনো সুর একটু চড়ে, কোনো সুর একটু ঝুলে যায়। তা তো হবারই কথা। প্রকৃতির হৃদয়তন্ত্রী থেকে এক ঘায়ে যা বেরয়, তা যে একঘেয়ে হবে— এ তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এইসব প্রাকৃত সুরকে সংস্কৃত করে নিতে বাধ্য।

এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা, প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ— এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ, এবং অন্ধের সংগীতে ব্যুৎপত্তি যে সহজ, এ সত্য তো লোকবিশ্রুত।

প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে— শুধু শব্দ নয়, গোলযোগ আছে— একথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, একথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই তো আর্ট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।

আর্টিস্টরা বলেন, প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যাঁর কান নেই, তাঁর কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি নর্তকী; কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা এবং পুরুষ শ্রোতা— একথা কোনো দর্শনেই বলে না। আর্টিস্টদের মতে তৌর্যত্রিকের একটি মাত্র অঙ্গ— নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি— গীত বাদ্য— তা নয়।

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নৃত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।

শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম; বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয় বাতাসের ধর্ম।

আকাশের নৃত্য অর্থাৎ সর্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের, এবং বাতাসের উক্তরূপ কম্পন থেকে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে— তা বৈজ্ঞানিকেরা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে স্বরের উৎপত্তি, সুতরাং জড়প্রকৃতির গর্ভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে, সৃষ্টির চরম আনন্দে; আর আকাশ-বাতাস কাঁপে বেদনায়, সৃষ্টির প্রসববেদনায়। সুতরাং আর্টিস্টদের মতে স্বর শব্দের অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ।

যেখানে আর্টে ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপোস-মীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিশ মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হতে স্বরের কিংবা স্বর হতে শব্দের উৎপত্তি— সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙে স্বরের, না স্বর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে— এককথায়, স্বর আগে না রাগ আগে। অবশ্য রাগের বাইরে সার্গমের কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং সার্গমের বাইরে রাগের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং স্বর পূর্বরাগী কি অনুরাগী, এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন যাঁরা বলতে পারেন বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে; অর্থাৎ কেউ পারেন না।

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর-কোনো খণ্ডন নেই। তবে বৃক্ষায়ুর্বেদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে, সে রহস্যের ভেদ তাঁরা বাৎলাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। কেননা, ওকথা শোনবামাত্র আর-এক দলের বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পরমাণুবাদীরা, জবাব দেবেন যে সংগীত আয়ুর্বেদের নয় বায়ুর্বেদের অন্তর্ভূত; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, আমি কর্তা তুমি ভোক্তা এ জ্ঞান যার নেই, তিনি আর্টিস্ট নন। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বোধন ক'রে— তুমি কর্তা আমি ভোক্তা— একথা কোনো আর্টিস্ট কখনো বলতে পারবেন না, এবং ওকথা মুখে আনবার কোনো দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ— আমরা পৃথিবীসুদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সুরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।

অতএব দাঁড়াল এই যে, সংগীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজ মানুষে চায় তার স্থিতি, ভিত্তি নয়।

৪

অতঃপর দেশী বেলেতি সংগীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক।—

এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক্, তা অবশ্য ক-খ-গত নয়। যে বারো স্বর

এদেশের সংগীতের মূলধন, সেই বারো সুরই যে সেদেশের সংগীতের মূলধন— একথা সর্ববাদিসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সুদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনো ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড়-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমি পূর্বে দেখিয়েছি যে, সুরের এই অতিসুদের লোভে আমরা সংগীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশি-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশীর সঙ্গে বিলেতি সংগীতের আসল প্রভেদটা ক-খ নিয়ে নয়, কর-খল নিয়ে। BLA = ব্লে - CLA = ক্লের সঙ্গে কর-খলের, কানের দিক থেকেই হোক আর মানের দিক থেকেই হোক, একটা-যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে— এ হচ্ছে একটি 'প্রকাণ্ড সত্য'। এ প্রভেদ উপাদানের নয়, গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের, এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।

সুতরাং আমরা যদি বিলেতি ব্যাকরণ অনুসারে সুর সংযোগ করি তা হলে তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে, এবং তাতে অবশ্য রাগের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে ইংরেজিভাষা লিখলে সে লেখা ইংরেজিই হয়, এবং তাতে বাংলাসাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, যদিচ এক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয় শব্দও বিদেশী। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরেজি এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে, এবং সেইসঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে, তা বাবু-ইংলিশ হয়, এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখলে তা সাধুভাষা হয়— তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বসলে সংগীতেও আমরা রাগ-মেলডির একটি খিচুড়ি পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়ি-ভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সংগীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ করতে চাই নে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

৫

দেশী বিলেতি সংগীতের মধ্যে আর-একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আমাদের নেই।

এই হারমনি-জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বই আর-কিছুই নয়, অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনও প্রথম-ভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয়ভাগের চর্চা করা উচিত কি না, সেবিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয়ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথমভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলুন আর না-ভুলুন, তাঁরা যে প্রথমভাগকে